131

তারিখ ... 18 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রসঙ্গ ।। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট

তৃতীয় বিশ্বের আর পাঁচটি দেশের মতো এ দেশেও আন্দোলন-সংগ্রাম, মিছিল-সভা, হরতাল-ধর্মঘট নতুন কিছু নয়। দীর্ঘকাল ধরেই এ প্রক্রিয়া এ দেশে প্রচলিত রয়েছে। যখন কোন বিশেষ গোষ্ঠী, সংগঠন বা সমাজ মনে করে যে, সে কোন ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাকে অন্যায়ভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তার মর্যাদাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হচ্ছে তখনই সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী-সংগঠন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফলে স্মারকলিপি পেশ, বাদানুবাদ ও সবশেষে ধর্মঘট-হরতালের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ন্যায্য দাবি আদায় ও অধিকার সংরক্ষণে এ প্রক্রিয়া যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই স্বীকৃত।

দৈনিক ইত্তেফাকের ১৬ নবেম্বর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ভিতরের বক্তব্য হচ্ছে "বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ প্রথম শ্রেণীর সকল সরকারী পদে পাস কোর্সের ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তরদের নিয়োগের সুযোগদান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মাস্টার্স প্রিলিমিনারীতে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখার দাবিতে শিক্ষা ও চাকরিতে বৈষম্য প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিষদ আজ (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ দিবস ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করিয়াছে।" বর্তমান রচনায় বিষয়টির অনুপুঙ্খ আলোচনা-পর্যালোচনা ও যৌক্তিতা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

আহূত ধর্মঘটটি পালিত হয়েছে। আমি ধর্মঘটের বিরুদ্ধে নই। তারপরও বক্তব্য হলো— প্রতিটি ধর্মঘটের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। একটি ধর্মঘটকে ইতিবাচক হতে হলে একে চারটি শর্তসম্মত হতে হবে। প্রথমত যৌক্তিকতা। অর্থাৎ যাঁরা ধর্মঘট ডাকছেন তাঁদের দাবি ন্যায়সঙ্গত

সাখাওয়াৎ আনসারী

কি না। দ্বিতীয়ত যে লাভের জন্য দাবি তা আদায় করতে গিয়ে যেন দেশ ও জাতির ক্ষতি তার থেকে বেশি না হয়। তৃতীয়ত ধর্মঘট ডাকার আগে তার পূর্ববর্তী কার্যক্রম শেষ করে আসতে হবে। অর্থাৎ স্মারকলিপি পেশ, কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক ও দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা, সভা এবং মিছিল করার পরই শুধুমাত্র ধর্মঘট ডাকা যেতে পারে। চতুর্থত সঠিক সংগঠনকে সঠিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালনের ব্যবস্থা থাকা। উপরোক্ত চারটি শর্তের কোন একটির অভাবেই ধর্মঘটটি তার বলিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে নেতিবাচক হয়ে পড়ে। এখন উপরোক্ত শর্তগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট ধর্মঘটটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রকাশিত সংবাদের বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— (ক) ধর্মঘট আহ্বানকারী- শিক্ষা ও চাকরিতে বৈষম্য প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিষদ; (খ) দাবি দু'টি— (১) বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ প্রথম শ্রেণীর সকল সরকারী পদে পাস কোর্সের ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তরদের নিয়োগের সুযোগ দান ও (২) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মাস্টার্স প্রিলিমিনারীতে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখা; (গ) কোথায় এবং কখন ধর্মঘট— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ণদিবস।

দাবি দু'টি দেখে 'সংগ্রাম পরিষদ' কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে তা মোটামুটি আঁচ করা যায়। এমন ধারণা করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, যারা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাস কোর্সে পড়াশোনা করেছে অথবা করছে তারাই এ 'সংগ্রাম পরিষদের' সাথে জড়িত। পরিষদের নামটি প্রমাণ করে যে, পরিষদের মতে বাংলাদেশে শিক্ষা ও চাকরিতে বৈষম্য রয়েছে এবং তা অনতিবিলম্বে প্রতিরোধ করা কর্তব্য। যদি তাই-ই হয় তবে বিষয়টি মহৎ, যৌক্তিক এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই অভিপ্রেত ও বলিষ্ঠভাবে সমর্থনীয়।

প্রথম দাবিটি বিচার করা যাক। দেশে বর্তমানে দু'ধরনের স্নাতক কোর্স প্রচলিত আছে। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতক (পাস)। প্রথমটি তিন বছরের। এতে কোন একটি বিষয়ে ন' শ' নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট দু'টি অনুষঙ্গী বিষয়ে তিন শ' করে মোট ছ' শ' নম্বর অর্থাৎ মোট পনেরো শ' নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্বল্পসংখ্যক কিছু বড় ও প্রতিষ্ঠিত সুখ্যাত কলেজে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয়টি দু'বছরের। এতে এক শ' নম্বরের মাতৃভাষা বাংলা এবং তিনটি বিষয়ে তিন শ' করে মোট ন' শ' নম্বর অর্থাৎ মোট এক হাজার নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয় (অবশ্য স্নাতক সম্মান ও পাস উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুষদভেদে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। এখানে সাধারণ হিসাবটি আলোচনা করা হয়েছে)। এ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই দেশে সর্বাধিক এবং বাংলাদেশের ছোট-বড় প্রায় সকল স্নাতক পর্যায়ের কলেজেই এ পর্যায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী লাভের পর যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করতে চায় তাদের ঐ বিষয়ে পাঁচ শ' নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। সময় এক বছর। আর যারা স্নাতক (পাস) থেকে এসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করতে চায় তাদের স্নাতক পর্যায়ে পঠিত যে কোন বিষয়ে অথবা অনুমোদিত সম্পর্কিত বিষয়ের যে কোন একটিতে স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব

এবং শেষ পর্ব উত্তীর্ণ হতে হয়। স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বে পাঁচ শ' নম্বরের জন্য এক বছর এবং শেষ পর্বে পাঁচ শ' নম্বরের জন্য এক বছর অর্থাৎ মোট দু'বছরের জন্য এক হাজার নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়।

অর্থাৎ যারা স্নাতক (সম্মান) থেকে এসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে তাদের ৩+১=৪ বছরে মোট ৯০০+(৩০০+৩০০)+৫০০=২০০০ নম্বরের পড়াশোনা করতে হয়। আর যারা স্নাতক (পাস) থেকে এসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে তাদের ২+(১+১)=৪ বছরে মোট (১০০+৩০০+৩০০+৩০০)+৫০০+৫০০=২০৫০ নম্বরের পড়াশোনা করতে হয়।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, স্নাতক (সম্মান) ও (পাস) কোর্স থেকে আসা দু'জন ছাত্র সমসময় অর্থাৎ চার বছর পড়াশোনা করে সমপরিমাণ নম্বর অর্থাৎ দু'হাজার নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে দেশের যে কোন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যক্রম অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করছে। উভয় ক্ষেত্রে যেহেতু কোন পার্থক্য নেই সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা অবৈধ এবং অযৌক্তিক। উপরন্তু, উদাহরণ দেয়া যেতে পারে দু'জন ছাত্রের হিসাবের। একজন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আবশ্যিক বাংলা এবং ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে বিএ (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করলো। আর একজন ছাত্র একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন অনুষঙ্গী নিয়ে ইতিহাসে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করল। প্রথম ছাত্র পড়েছে বাংলা ১০০+ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩০০+ দর্শন ৩০০ + ইতিহাস (৩০০+৫০০+৫০০)=২০০০। দ্বিতীয় ছাত্র পড়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩০০+দর্শন ৩০০+ ইতিহাস (৯০০+৫০০)= ২০০০। প্রথম ছাত্র বাংলা পড়েছে ১০০ এবং ইতিহাস পড়েছে ১৩০০, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ছাত্র বাংলা পড়েনি, ইতিহাস পড়েছে ১৪০০। অর্থাৎ কোন বিচারেই দু'জন ছাত্রের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই।

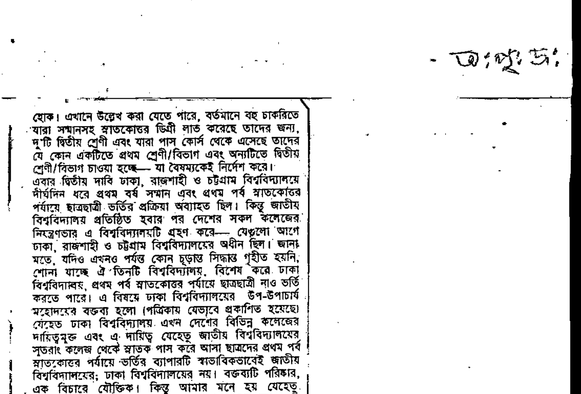

স্নাতক (পাস) একজন ছাত্রের সাথে স্নাতক (সম্মান) উত্তীর্ণ একজন ছাত্রের অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্তু স্নাতক (পাস) ছাত্রটি যখন স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব উত্তীর্ণ হয় তখন আর স্নাতক (সম্মান) উত্তীর্ণ ছাত্রের সাথে কোন পার্থক্য থাকে না। পক্ষান্তরে দু'পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব উত্তীর্ণ দু'টি ছাত্রের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই তা আগেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাব হচ্ছে স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব উত্তীর্ণ ছাত্রকে স্নাতক (সম্মান) স্থান প্রদান অথবা সমমানে আখ্যায়িত করা হোক এবং যে কোন পর্যায় থেকে আগত (সম্মান অথবা পাস) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী যে কাউকে সকল সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত চাকরিতে সমসুযোগ প্রদান করা হোক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানে বহু চাকরিতে যারা সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছে তাদের জন্য, দু'টি দ্বিতীয় শ্রেণী এবং যারা পাস কোর্স থেকে এসেছে তাদের যে কোন একটিতে প্রথম শ্রেণী/বিভাগ এবং অন্যটিতে দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ চাওয়া হচ্ছে— যা বৈষম্যকেই নির্দেশ করে।

এবার দ্বিতীয় দাবি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রথম বর্ষ সম্মান এবং প্রথম পর্ব স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশের সকল কলেজের নিয়ন্ত্রণভার এ বিশ্ববিদ্যালয়টি গ্রহণ করে— যেগুলো আগে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। জানা মতে, যদিও এখনও পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, শোনা যাচ্ছে ঐ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম পর্ব স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী নাও ভর্তি করতে পারে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মহোদয়ের বক্তব্য হলো (পত্রিকায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে) যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন দেশের বিভিন্ন কলেজের দায়িত্বমুক্ত এবং এ দায়িত্ব যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুতরাং কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে আসা ছাত্রদের প্রথম পর্ব স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। বক্তব্যটি পরিষ্কার, এক বিচারে যৌক্তিক। কিন্তু আমার মনে হয় যেহেতু বাংলাদেশের গুটিকয়েক কলেজ ছাড়া প্রায় সকল কলেজেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা নেই, প্রশিক্ষিত পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, উন্নত সরঞ্জাম নেই এবং যেহেতু স্নাতক (পাস) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই দেশে সর্বাধিক, সেহেতু দেশ ও জাতির বৃহত্তর মঙ্গল, সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই। জ্ঞানের দরোজা বন্ধ নয়, বিস্তৃত ও উন্মুক্ত করতে হবে।

এখন ধর্মঘট প্রসঙ্গ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণদিবস ধর্মঘট পালিত হবার কারণে কোন ক্লাস হয়নি। কোন পরীক্ষা হয়নি। আমার প্রশ্ন— প্রথম দাবিটির জন্য কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করা যায়? প্রথম দাবিটি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নয়। বিষয়টি পিএসসি অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ধর্মঘট আহ্বানকারীরা পিএসসি অথবা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, সংস্থাপনমন্ত্রী, শিক্ষাসচিব অথবা সংস্থাপন সচিব মহোদয়ের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারত এবং সে অনুযায়ী কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারত যেটা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত হতো বলেই আমার ধারণা। দ্বিতীয় দাবির ব্যাপারে প্রশ্ন— যারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মাস্টার্স প্রিলিমিনারীতে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখতে বলে তারা তো স্নাতক (পাস) পর্যায়ের ছাত্র অথবা স্নাতক (পাস) উত্তীর্ণ ব্যক্তি হবার কথা, তারা তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তারা অন্য কোথাও না ডেকে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই ধর্মঘট ডাকে কিভাবে? আমার কাছে বিষয়টি বোধগম্য নয়। এ ক্ষেত্রে তারা মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সাথে আলোচনা, দেন-দরবার করতে পারে। দায়িত্বের সাথে অধিকার সম্পর্কিত। যে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে যারা নেই সে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তাও ভেবে দেখার বিষয়। "বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে" ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখাই যদি দাবি হয় তবে অন্য দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়কে আওতামুক্ত রেখে শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকারই বা কি সদুত্তর আছে?

আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কোন বিশেষ দাবিতে কোন বিশেষ সংগঠন কর্তৃক ধর্মঘট ডাকা হয় তখন ঐ ধর্মঘটের দিনটি আসার অনেক আগ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন বহু ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী (ধর্মঘট সমর্থন করেন না এমন সংখ্যাই সাধারণত অধিক) এই মর্মে গুঞ্জন শুরু করে দেন যে অত তারিখের ঐ বারোদিন ধর্মঘট। কারা ডেকেছে, কি দাবিতে ডাকা হয়েছে, তা যৌক্তিক কি না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালিত হবার সম্ভাবনা আছে কি না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত না হলেও ঐ বিশেষ সংগঠনটি বলপূর্বক (যদিও অনুচিত) বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সামর্থ্য রাখে কি না ইত্যাদি ভাবাভাবি তারা প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজন মনে করেন না। অর্থাৎ তারা ছুটি ভোগ করার সুযোগ গ্রহণের অপেক্ষায় থাকেন। অনেকেই আবার এগুলোকে রাষ্ট্রীয় সাধারণ ছুটির সমপর্যায়ের ভেবে কর্মক্ষেত্রে না আসাকে স্বাভাবিক আইনসিদ্ধ অধিকার মনে করেন এবং বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার ধর্মঘট হলে শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটির সাথে মিলিয়ে পর পর দু'দিন ছুটি ভোগ করার আনন্দে উল্লসিত হয়ে ধর্মঘট আহ্বানকারীদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হতেও দ্বিধা করেন না। তাঁরা নিজেরাই আলোচনা-পর্যালোচনা করে পরিবেশকে ধর্মঘট আক্রান্ত করে তোলেন। এভাবে অনেক সময় অযৌক্তিক এবং অসমর্থনীয় ধর্মঘটের অনভিপ্রেত শিকার হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়। কোন সন্দেহ নেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠ। ছাত্র ও শিক্ষার মানসম্মত ভবিষ্যত সৃষ্টি করা যেমন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব তেমনি এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সুস্থ ও সক্রিয় রাখাও এ দেশের মানুষেরই দায়িত্ব। তা না হলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই থেকে যাব— তিমির হননে করে আলোকস্পর্শী হবার সৌভাগ্য আমাদের কখনই হবে না।

- অ:পু:উ: